চলে যায় দিন

অমিতা সেন

পুনশ্চ

৯এ নবীনকুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রাক্ কথন

বিগত বিশ বছর ধরে আমরা মাঝে মাঝেই শ্রীমতী অমিতা সেনের কাছ থেকে পুরোনো দিনের শান্তিনিকেতনের গল্প শুনতে পেয়েছি। সে ছিল শান্তিনিকেতন আশ্রমের পুণ্য প্রভাতকাল।

গতবছরই বইমেলাতে তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন পনেরোজন বিশিষ্ট আশ্রমিকের ব্যক্তিগত স্মৃতিচিত্র। এ বছরের বইমেলায় আমাদের প্রাপ্তি আরো একটি সংকলন গ্রন্থ। এতে রয়েছে লেখিকার মহামূল্যবান আশ্রমিক অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত কিছু রচনা। এই বইয়ের দুটি ভাগ। প্রথমটি "স্মৃতিসুধা"। তাতে পাই শান্তিনিকেতন আশ্রমের আরো আঠেরোজন অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের কাহিনী। যাদের মধ্য দিয়ে পুরোনো দিনের শান্তিনিকেতনকে আমরা খানিকটা স্পর্শ করতে পারি। "নিবন্ধ" অংশে আছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে লেখিকার পরিণত ভাবনাচিন্তার স্বচ্ছ প্রকাশ। নিবন্ধ সংখ্যা দশটি। দুটি বিভাগে মোট আটাশটি রচনা এখানে একত্রিত হয়েছে। শ্রীমতী অমিতা সেনের বর্ণময় আশ্রমস্মৃতির গ্রন্থমালায় নবতম পুষ্প সংযোজন এই বই।

সংস্কৃতির ইতিহাসে স্মৃতিকথার গুরুত্ব নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। মেয়েদের স্মৃতিকথা থেকে সমাজের কয়েকটি বিশেষ দিককে চিনতে পারা যায়। পুরুষদের স্মৃতিকথায় যা সাধারণত থাকে না। এই স্মৃতিমালিকায় ঘর-গৃহস্থলীর কথা নেই বটে—তবু এতে আছে আশ্রমের একটি নারীরই দৃষ্টিকোণ। আশ্রমবালিকা থেকে আশ্রমমাতা হয়ে ওঠা একটি মানুষীর অভিজ্ঞতার আয়নায় ধরা পড়েছে আশ্রমের মানুষ ও জীবন। যদিও বিষয়বস্তু বিশেষভাবে "মেয়েলি" বলে চিহ্নিত নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু নজরটি তো এক আশ্রমবালার। নারীর নজরে আশ্রমজীবনের অনেকগুলি দিকের ছায়া পড়ে যা পুরুষের নজরে পড়ে না (যেমন, রোদে রং কালো হয়ে যাবে বলে মায়েরা মেয়েদের তাড়াতাড়ি আশ্রম থেকে সরিয়ে বাড়ি নিয়ে যেতেন বিবাহের প্রস্তুতিতে)।

এখানে যাঁদের কথা পড়ছি, তাঁরা বঙ্গসংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাতঃস্মরণীয়। দিনু ঠাকুর থেকে মোহরদি, কালীমোহন ঘোষ থেকে সাগরময় ঘোষ। শুধু শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক জীবনের সঙ্গেই তাঁদের স্মৃতির অভিন্নতা নয়, তাঁদের অবদান বাঙালির সংস্কৃতির ইতিহাসে চিরন্তন হয়ে থাকবে। এমনই পনেরোজন প্রণম্য ব্যক্তিত্বকে লেখিকা পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন, শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়, তাঁর একান্ত নিজস্ব বাচনভঙ্গিতে।

নিবন্ধগুলি লিখিত হয়েছিল মূলত অনুরোধ রক্ষার খাতিরে কখনো কোনো উৎসব-সভায় ভাষণের জন্য, কখনো কোনো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশনের জন্য। তারই মধ্যে আমরা পেয়ে যাই নটীর পূজার জন্মকথা, আলাপিনী শ্রেয়সীর বৃত্তান্ত, আরো একটি সমসাময়িক আশ্রমকন্যার প্রকাশিত স্মৃতিকাহিনীকে অবলম্বন করে আগ্রহী সমালোচনা। নিবন্ধগুলির মধ্যেও তাই সুখস্পর্শ লেগে আছে লেখিকার স্মৃতিসুধার— এই অংশ থেকেও পুনর্বার আশ্রমিক জীবন সম্পর্কে আমরা নানান তথ্য জানতে পারি।

শ্রীমতী অমিতা সেনের সবগুলি রচনাতেই তাঁর রবীন্দ্রচেতনা রূপায়িত। সংকলিত নিবন্ধগুলিতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে আশ্রমিক মূল্যবোধ। স্মৃতিচিত্রে পরিবেশিত তথ্যগুলির বিষয়ে আমি বিচারের মধ্যে যাব না, সে দায়িত্ব আশ্রমিকদের। আমি শুধু পাঠক হিশেবে বলতে পারি সুখপাঠ্যতার কথাটুকু।

গত বছরে প্রকাশিত স্মৃতিকথনটি পড়ে আশা প্রকাশ করেছিলুম তাঁর কাছে হয়তো আরো কিছু পুরোনো দিনের কথা শুনতে পাওয়া যেতে পারে। পাঠকের সেই আশাই এই গ্রন্থে পূরণ করেছেন শ্রীমতী অমিতা সেন।

নবনীতা দেব সেন

"ভালো বাসা"
৩০ নভেম্বর
২০০০

ভূমিকা

জন্মকাল থেকে আজ ৯০ ছুঁই-ছুঁই বয়সে অতীতের স্মৃতিতে আজ আমার মন শুধু মধুময় বলব না, বলব উত্তাল করে তুলেছে। মন খুলে কি আমি সে সব কথা সকলের জন্য বলে যেতে পারবো! আমার 'শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা' বইটিতে আমি লিখেছিলাম রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সেকাল' কবিতায় লিখেছেন—

আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে,
একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে রাজার কাছে নিতাম চেয়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে কানন-ঘেরা বাড়ি
রেবার তটে চাঁপার তলে সভা বসত সন্ধ্যা হলে,
ক্রীড়া শৈলে আপন-মনে দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি
জীবন-তরী বহে যেত মন্দাক্রান্তা তালে,
আমি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে।।

আরো লিখেছিলাম—

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কালকে পাননি। আমরা পেলাম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কালকে। বিশ্বকবিকে পেলাম তাঁর নবরত্নের মাঝে। পরম সৌভাগ্যের জোরে আমরা পেলাম কবির উজ্জয়িনী শান্তিনিকেতনের বিজন প্রান্তে কাননঘেরা বাড়ি— শিরিষ বকুল শেফালি তলে কবির সুকণ্ঠের গান, আবৃত্তি, পাঠের ভিতর দিয়ে আমাদের জীবনতরী সেদিনে বয়ে চলত মন্দাক্রান্তা ছন্দে।

সেই জীবনতরী চলার পথ যে সবসময় ফুল-বিছানো থাকতো তা কিন্তু নয়। অনেক বাধা বিঘ্ন আশ্রমগুরু পার হতে পারতেন না যদি না মহাসাধক জগদানন্দ রায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীমোহন ঘোষ, ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নেপালচন্দ্র রায়, প্রমোদারঞ্জন ঘোষ এবং তাঁদের পাশেপাশে দরিদ্র আশ্রমের গুরুপত্নীরা সংসারের হাল না ধরতেন।

আশ্রমজননীদের সঙ্গে নবরত্নদের সহৃদয় সাহচর্যেই রবীন্দ্রনাথের বহু ভাবনা রূপ পাওয়া সম্ভব হয়েছিল আমাদের সব হতে আপন এই শান্তিনিকেতন। তাই আমি আশ্রমকন্যা শান্তিনিকেতনে আমাদের

জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যখনই কিছু লিখব তখন শুধু আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ নয়, লিখব তাঁদেরও কথা, বলতে দ্বিধা করব না যাঁদের পাশে না পেলে আজকের এই শান্তিনিকেতনকে আমরা পেতাম না— পরিপূর্ণরূপে পেতাম না। তারই সঙ্গে আমি লিখব আশ্রম গড়ে উঠেছিল নানা শুভ-অশুভ-র সঙ্গে লড়াই করে, সে লড়াই আজও চলছে। আবারও আশ্রমকন্যা আমি বলব আশ্রমকে কোনো অশুভ শক্তি ভাঙতে পারেনি, পারবেও না।

আমার জীবনের শেষ প্রান্তে আজ আমাদের সব হতে আপন শান্তিনিকেতনে 'প্রতীচী' বাড়িতে সশ্রদ্ধ ঔৎসুক্য নিয়ে প্রবীণ-নবীনজনেরা সকলেই আসেন আমার কাছে সেকালের কাহিনী শুনতে— আমিও আমার সৌভাগ্যে ভরা অমূল্য স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসে ওঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় গল্পগুজবে বেশ আনন্দ পাই— এরই মধ্যে আমি দেখতে পাই আশ্রমগুরুর শান্তিনিকেতনের সুদৃঢ় ভবিষ্যৎ। এই প্রসঙ্গেই আমি আশ্রমকন্যা পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে আমাদের উপচে-পড়া আনন্দের মধ্যে আশ্রমজীবনের দু'একটি গভীর বেদনাদায়ক সত্য তথ্য জানিয়ে গেলাম যাতে করে আমাদের প্রণম্য আদর্শবাদী ত্যাগীগুরুদের কোনো অসত্য কলঙ্ক স্পর্শ না করে। সদা শিল্পকাজে ব্যস্ত আমাদের অতিপ্রিয় শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র রথীদার জন্মশতবর্ষপূর্তিতে তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম জানাই। আজকের এই শান্তিনিকেতনের রূপকার নিরলস, নীরব কর্মী রথীদা শান্তিনিকেতনকে জটিল অপবাদ থেকে রক্ষা করতে স্বয়ং তিনি আশ্রম ত্যাগ করেন। উপাচার্য হিসেবে ওঁর মতো শান্তিনিকেতনকে ভালোবেসেছেন এমন একজনকেও দেখিনি। আজ তাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তিতে বার বার তাঁকে প্রণাম জানাই।

পরম শ্রদ্ধেয় বিধুশেখর শাস্ত্রী উচ্চতর বেতনের আকর্ষণে শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় ছেড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন— প্রচলিত এই তথ্যটি সম্পূর্ণ ভুল। তিনি আশ্রম বিদ্যালয় থেকে চলে গেলেন, এর পিছনে অর্থ নয়, যশ নয়, বর্ধিত হারে বেতনও নয়— ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সুপরিকল্পিত আদর্শভঙ্গকারী একটি গভীর বেদনাদায়ক ঘটনার প্রতিবাদে। তখন আমি ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্রী। আমাদেরই এক সহপাঠীর সঙ্গে তদানীন্তন এক শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কুফলে

মর্মান্তিক কলঙ্কজনক দুর্ঘটনায় ক্ষুব্ধ অভিভাবক আশ্রমবিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন কোর্টে। তদানীন্তন আশ্রম বিদ্যালয় পরিচালনায় যাঁরা ছিলেন এই শিক্ষকটি হলেন তাঁদেরই একজন।

আশ্রম বিদ্যালয়কে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাতে এবং সুনাম রক্ষার্থে আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রীর শর্তসাপেক্ষ অনুরোধে মামলাটি তুলে নেন ছাত্রীর অভিভাবক। শর্তটি হল ওই শিক্ষকটিকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। শিক্ষকটি বরখাস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তার কিছুকাল পরে যাঁদের হাতে পরিচালনার ক্ষমতা ছিল তাঁদের মধ্যে বিচলিত নবীন সদস্যরা তাঁদেরই প্রিয়বন্ধুকে আবার ফিরিয়ে আনলেন তাঁর স্বস্থানে। সত্যভ্রষ্ট এই ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে মর্মাহত শাস্ত্রীমশাই অত্যন্ত বিচলিত হয়ে প্রতিবাদস্বরূপ আশ্রমবিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

শাস্ত্রী মশায়ের উদ্দেশ্যে ছাত্ররা বিদায় সভার আয়োজন করে, তাতে তিনি ছাত্রদের আশীর্বাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। কোলকাতায় গিয়ে তিনি প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী আমাদের আশীর্বাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর শেষ কথাটি হল কোনার্কে গুরুদেবকে প্রণাম করে অশ্রুঝরা চোখে গাড়িতে চললাম, সেই অবিরাম অশ্রু আমি কোলকাতা পৌঁছান পর্যন্ত রোধ করতে পারিনি।

এ তো গেল আমাদের গভীর মর্মবেদনার কথা। এর পরে শাস্ত্রী মশায়ের সম্বন্ধে দু-একটি মিষ্টি কাহিনী না লিখে পারছি না। বেশ কিছু বছর পার হয়ে গেল কালের প্রবাহে। একবার শাস্ত্রীমশাই এলেন শান্তিনিকেতনে। তখন ক্ষিতিমোহন এবং শাস্ত্রীমশাই দু'জনেই বৃদ্ধ। খবর পেয়ে আমি ছুটে গেলাম পাশেই আমার বাপের বাড়িতে। কী সুন্দর ওঁদের দু'জনের কথাবার্তা! সব তো আমি লিখতে পারবো না। তবে একটি কথা না লিখে পারছি না। কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ শাস্ত্রী মশাই আমার বাবাকে বললেন, ক্ষিতি, তোমার হাত দুটো এত কাঁপছে কেন সারাক্ষণ? তার উত্তরে আমার সুরসকি বাবাও বলেছিলেন, বিধু, তোমার মাথাটিও যে সারাক্ষণ কাঁপছে— আমরা যে দুজনেই এখন বৃদ্ধ! বলে দুই সখার সে কী সুন্দর প্রাণখোলা হাসি!! এই দুর্লভ দৃশ্য আমি দেখতে পেলাম, এই দুর্লভ কথা আমি শুনতে পেলাম।

তখন মনে পড়ল এই 'বিধু' যৌবনকালে কাশী থেকে আমাদের গ্রাম সোনারঙে বন্ধু ক্ষিতিমোহনকে সর্বদাই চিঠি দিতেন এবং চিঠিটি শেষ

করতেন 'ইতি তোমারই বিধু।' তখন আমাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে মহা দুশ্চিন্তা হয়েছিল। এই বিধু মহিলাটি কে? আমার অতিশয় সুরসিক বাবা ওদের কাছে মিষ্টি হাসতেন কিন্তু কখনো বিধু যে কে সে কথা বলেননি। 'তোমারই বিধু' হলেন আমাদের শাস্ত্রী মশাই।

আমার 'শিরীষ বকুল আমের মুকুল' বইটিতে জগদানন্দবাবুর ক্লাসের কথা লিখেছি। এরপর এল নতুন যুগ। তদানীন্তন শান্তিনিকেতনের পরিচালনায় ভারপ্রাপ্তরা ৬০ বছর বয়সে কর্মে অবসর নির্দিষ্ট করেন। শিক্ষাদান থেকে বাধ্যতামূলকভাবে জগদানন্দবাবুর ও সেই আইনের জন্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল। শান্তিনিকেতনে আসার আগেই বৈজ্ঞানিক জগদানন্দ রায় একটি মহিলার ছদ্মনামে তাঁর উচ্চমার্গের বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ রচনা প্রকাশ করতেন। জগদানন্দের রচনা পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ ক্ষমতায় আবিষ্কার করলেন ইনি একজন পুরুষ, মহিলা নন। শুধু তাই নয়, তাঁকে সমাদরে নিয়ে এলেন শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে। তাঁর আশ্রমবিদ্যালয়ের শিক্ষাটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সংগীত, নৃত্য। শিল্পের সঙ্গে বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারাও যেন মিশে থাকে।

জগদানন্দবাবুর জীবন ছিল শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের ঘিরে। সেটি বন্ধ হল। ছাত্রছাত্রীদের থেকে বিযুক্ত হয়ে তিনি আর বেশিদিন বাঁচলেন না। ছাত্ররাই তো তাঁকে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আশ্রম হারাল একজন অতিবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক যিনি রেখে গেলেন কয়েকটি সহজবোধ্য অসাধারণ বিজ্ঞানের বই। যে বই ছোটবেলা থেকে বুড়ো পর্যন্ত সবাই নির্বিচারে পড়ে আজও কি আনন্দই না পান! পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। কাদের নিয়ে তিনি বাঁচবেন! যাঁকে আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করে আদরে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন তাঁর হাতে গড়া অতিসাধের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে। আর তো কোথাও যাবার জায়গা ছিল না তাঁর.....।

নেপালচন্দ্র রায়কেও আশ্রম বিদ্যালয়ের কর্মে অবসর নিতে হয় একই নিয়মে ৬০ বছর বয়সেই। যাঁর হাতে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কারের টাকাটা তুলে দিয়েছিলেন আশ্রম বিদ্যালয়ের জন্য। তবে তিনি সে যুগের হিন্দুমহাসভার সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকায় তাঁর অবসর জীবন কাটানোয় কোন সমস্যা ছিল না।

আচার্য হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এই নির্ধারিত নিয়মে ৬০ বছর বয়সে কর্মে অবসর নিতে হয়েছিল কিন্তু তাঁর কর্মজীবন ছিল 'শব্দকোষ' রচনায় উৎসর্গীকৃত। সেই কারণে তিনি জগদানন্দবাবুর মতো শূন্যতা বোধ করেন নি।

আচার্য নন্দলাল বসু ও আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনকে ছুঁতে পারেননি নবগঠিত কর্তৃপক্ষ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই নবগঠিত কর্তৃপক্ষের ধার্য-করা আইনের দুঃখজনক পরিস্থিতি কি রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পেরেছিলেন? এর উত্তরে বলব, আমরা জানি তাঁরও কথার মর্যাদা সেদিন কেউ রক্ষা করেননি-- মনে তিনি গভীর দুঃখ পেয়েছিলেনই। আশ্রমগুরুকে সেদিন সবকিছুই ভালোমন্দ মেনে নিতে হয়েছিল, এর বেশি আমি কিছু বলতে চাইনা। যখন তাঁর আমন্ত্রিত শিক্ষকদের একে একে নবগঠিত আইনের স্বার্থে (৬০বছরে) অবসর গ্রহণে বাধ্য করল তখন একদিন ব্যথিত স্বরে ক্ষিতিমোহনকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনিও কি আমাকে ছেড়ে যাবেন?" এর উত্তরটি বাবার মুখে আমরা বাড়িতে বসে শুনেছিলাম। বাবা মাকে এসে বললেন, "কিরণ, আজ আমি 'কবিকে' কথা দিয়ে এলাম, আপনাকে ছেড়ে আমি কোনোদিনও যাব না।"

আমি, 'বড়মা' হেমলতা ঠাকুর, কৃতি ঠাকুরের পত্নী সুকেশী দেবী, 'খুড়িমা' কালীমোহন বাবুর পত্নী মনোরমা দেবীরা দিনদার পত্নী কমল বৌঠান, রথীদার পত্নী প্রতিমা বৌঠান,আশ্রমের 'ঠানদি' আমার মা কিরণবালা সেন সকলের স্নেহধন্যে ও শিক্ষায় সৌভাগ্যবতী। আমি তাঁদের কাছে যে শিক্ষা পেয়েছি সেই শিক্ষার বলেই আমি অতিসূক্ষ্ম সংবেদনশীল বিষয়ে আলোচনা করবার সাহস রাখি।

এইসব প্রণম্য আশ্রমজননীদের সহৃদয় সাহচর্য না পেলে শুধুমাত্র দিনদা, বিধুশেখর, নন্দলাল, ক্ষিতিমোহনকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আশ্রম গড়ে তুলতে পারতেন না। আমি সেকালের আশ্রমকন্যা। কী দারিদ্র্যের মধ্যে যে তাঁরা সংসার চালিয়েছেন— সেই দুঃখের স্মৃতি আমাদের পরিবর্ত জীবনে আজও মনে গেঁথে আছে।

একবার বিদেশ থেকে ফিরে এসে সদ্য লিখিত 'গুরুদেব' নামে পুস্তকটি পড়ার আমার সৌভাগ্য হল। বইটির অনুলেখিকা রানী চন্দ।

বইটি খুব সুন্দর। কিন্তু সেই বইটিতে উনি লিখেছিলেন গুরুপত্নীদের কাছে যতখানি আশা করেছিলেন তা তিনি পাননি। এই উক্তিতে আমি খুব বেদনাবোধ করেছি। গুরুদেব জীবিত থাকলে আমি খুব ঝগড়া করতাম তাঁর সঙ্গে। আমি তাঁকে বলতাম, "আপনারই ভাষায় আপনি যাকে বলেছেন 'শ্রেষ্ঠদান'— গুরুপত্নীরা দরিদ্র সংসার চালিয়ে যা দিয়েছেন সেটাও তাঁদের শ্রেষ্ঠ দান। আমার মতে আরও বলব উছ্‌লে পড়া দান।"

রবীন্দ্রনাথের আশ্রমের এই ত্যাগী গুরুদেব ৬০ বছর বয়সে অবসরের পর তাঁদের কিভাবে দিন চলবে সেকথা কেউ ভাবেননি। তখন তো কোনো পেনসনের ব্যবস্থা ছিল না। ভেবেছিলেন একমাত্র নীরব কর্মী সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাঁর সুচিন্তিত পরিকল্পনায় গড়ে উঠল কলকাতার নিউ আলিপুর। নিউ আলিপুরেই স্বল্প পরিমাণে জমি অতি অল্পদামে অবসরপ্রাপ্ত শান্তিনিকেতন আশ্রমের গুরুদেব দিয়েছিলেন।

এখানে একটা কথা বলি যা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না— দেশের জন্য সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান কেউ জানতে পারেনি— জানতেও পারল না। তাঁর চরিত্রের চিন্তাধারা, দেশের জন্য নীরব দানের কথা অলিখিতই রয়ে গেল। আমার বয়স থাকলে, সামর্থ্য থাকলে সুরেন ঠাকুরের দেশের দশের অবদানের বিষয় নিয়ে আমি বেশ কিছু লিখে যেতে পারতাম। সবটুকু না পারলেও। ভাবীকালকে জানিয়ে গেলাম সুরেন ঠাকুরকে তোমরা বিস্মরণের স্তর থেকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরো, তাতে একালের সর্বজনের উপকার হবে। যাঁরা এই দেশপ্রেমিক প্রচারবিমুখ সুরেন ঠাকুরের যথাযোগ্য তথ্যপূর্ণ অবদানের কথা ভাবীকালের জন্য তুলে ধরবেন তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

নিউ আলিপুরের এই জমিটুকুর প্রসঙ্গে বলি, আমার বাবা আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন জমিটুকু বিক্রি করে আমার বিবাহকার্য সমাধা করেছিলেন। আরো আমার বলতে ইচ্ছে করছে— মনে করি বিষয়টি অবান্তর হবে না। ধনী ঘরের সন্তান, শ্রদ্ধেয়া প্রখ্যাত লেখিকা সীতাদির ভাষায় 'বিলেত ফেরৎ' ডঃ আশুতোষ সেন মোটর লঞ্চ, মোটর গাড়ি এসব বিভিন্ন ধনী ঘরের পাত্রী পক্ষ থেকে যৌতুক দেবার প্রস্তাব উপেক্ষা করে তিনি আমায় শান্তিনিকেতনের এই গুরুপল্লীর খড়ের ছাওয়া মাটির কুটির থেকে বধূ হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু কেন?

আমি তো রূপসী নই, বিদুষী নই, ধনী পরিবারের কন্যাও নই, তবে কী দেখে তিনি আমায় জীবনসঙ্গিনী করেছিলেন? আমার মনে হয় আমি রবীন্দ্রনাথের আশ্রমকন্যা, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন ও 'আশ্রমের ঠানদি' কিরণবালা সেনের কন্যা হিসেবে। যে কিরণবালা সেনের সম্বন্ধে বড়মা হেমলতা ঠাকুর লিখে গেছেন, "কিরণের চরিত্রের মধ্যে একটি এমন আদর্শ আছে যেটি নারীদের বিশেষভাবে অনুসরণ করা কর্তব্য। তাহাতে মেয়েরা নিজেও সুখী হইবে এবং অন্যকেও সুখী করিতে পারিবে।'

আমি বিয়ের পর বিস্মিত হয়ে আমার স্বামীর কাছে জানতে চেয়েছিলাম কি দেখে উনি আমাকে সেকালের সমস্ত ধনী, রূপসী, গুণী মেয়েদের ছেড়ে আমায় বরণ করলেন— উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "তোমার দুর্দান্ত চঞ্চল স্বভাবের জালে আমি জড়িয়ে পড়লাম।"

আমার স্বামীর গভীরতর প্রেমে ভালোবাসায় আমার চঞ্চল স্বভাবের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি একে একে সব চলে গেল— মন ভরে উঠল উছলে পড়া আনন্দে। আজকের দিনে অনেকের প্রশ্ন আসে, আমার সন্তানেরা কোথা থেকে এত গুণ পেল, উত্তরে আমি বলি—

আদর্শবান, সত্যপরায়ণ, অসাধারণ ওদের বাবার থেকেই পেয়েছে। ১লা শ্রাবণ আমার জন্মদিন বলেও রবীন্দ্রনাথ আমায় 'শ্রাবণী' বলে ডাকতেন। সেই কালে আমার ও যমুনার সম্পাদনায় 'গুরুপল্লী' নামে যে হাতে-লেখা পত্রিকা বার হতো তার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ "শ্রাবণী" বলে একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন।

তখন হাতে-লেখা পত্রিকাগুলি থাকতো লাইব্রেরির রিডিং রুমে। বড়ই দুঃখের সঙ্গে আবিষ্কার করলাম সেখানে পত্রিকাটি আছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা 'শ্রাবণী' কবিতাটি নেই— কেউ কেটে নিয়ে গেছে। কখনো যদি 'শ্রাবণী' কবিতাটি কারো হাতে পড়ে আমার অনুরোধ তারা যেন আমার নাতি-নাতনিদের কাছে স্বীকৃতি জানায়।

সেদিনের অপরিণত বুদ্ধিতে কবিতাটির কোন কপি রাখিনি। সৌভাগ্যবশত তাঁর হাতের লেখা 'বধূ' কবিতাটি বিবাহবাসরে আমার হাতে দেওয়ায় সেটি রক্ষা পেয়েছে।

এই ৯০ ছুঁই-ছুঁই বয়সে আমার লিখিত রচনাগুলিকে একত্রে গেঁথে ছাপাবার জন্য কেন আমি আগ্রহী হ'লাম— উত্তরে বলব যশস্বিনী

সুসাহিত্যিকা আমার আদরের নবনীতার আন্তরিক অনুপ্রেরণা এবং কল্যাণীয় নীলাঞ্জন এবং অরবিন্দের উৎসাহ ও সহযোগিতায় আমি উদ্দীপিত হয়ে ভাবীকালের জন্য কিছু সেকালের সত্য তথ্য পরিবেশন করে গেলাম। স্মৃতির আলোড়নে আমার সেকালের নানা কথা মনকে উদ্বেলিত করে তুলেছে। পরবর্তীকালে আরো কিছু শুনিয়ে যাবার ইচ্ছা রইল, জানি না তা পারবো কিনা। এদের জন্য রইল আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আশীর্বাদ।

বেশ কিছুকাল থেকে আমার নিজের হাতে লেখবার ক্ষমতা চলে গেছে। তাই স্নেহের অরবিন্দ আমার সমস্ত লেখারই অনুলিখন করে থাকে। তার সহায়তা ছাড়া আমার একটিও বক্তব্য লিখিত প্রকাশ করা সম্ভব নয়— তাকে আমি প্রাণভরা আশীর্বাদ জানাই। আর যাঁরা আমার মতো গৃহিণীর রচনা সংগ্রহ করে লাভ-লোকসানের ভাবনা না ভেবে অতি আদরে আমার বই ছাপছেন সেই 'পুনশ্চ' প্রকাশনের শ্রীযুক্ত সন্দীপ নায়ক ও তাঁর সহযোগী কর্মীজনদের জানাই আমার কৃতজ্ঞতা এবং আশীর্বাদ। নানা উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আশ্রমকন্যা আমি মন খুলে যে সব সুখ-দুঃখের কাহিনী বলেছিলাম বা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনুরুদ্ধ হয়ে যে সব রচনা লিখেছিলাম তার থেকেই কল্যাণীয় অরবিন্দ এবং নীলাঞ্জন কয়েকটি রচনা বেছে নিয়ে একসঙ্গে গেঁথে ভাবীকালের উদ্দেশ্যে রেখে গেল। আমি এতে তৃপ্ত।

'প্রতীচী'
শান্তিনিকেতন

আশ্রমকন্যা অমিতা সেন
১১-১২-২০০০

বিষয়সূচি

স্মৃতিসুধা ১৯-১২৬

সুরের গুরু দিনেন্দ্রনাথকে আমার
অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ — ২১
আশ্রমিক অনাদিদা— ৩২
শ্রদ্ধায় স্মরণ ঃ শান্তিদেব ঘোষ — ৩৬
গুরুপল্লীর সেই মেয়েটি— ৩৯
পল্লী-সঞ্জীবনে ব্রতী রবীন্দ্রনাথের প্রধান
সহায়ক আশ্রমিক কালীমোহন ঘোষ — ৪৫
আশ্রমিক নন্দলাল— ৫৪
রবীন্দ্রনাথের সুবল-সখা ক্ষিতিমোহন সেন — ৬৭
আশ্রমবন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের
জন্মশতবর্ষে স্নেহভাজন বিশ্বভারতীর
কর্মীবৃন্দের সঙ্গে আশ্রমকন্যা
আমার শ্রদ্ধানিবেদন — ৭০
কবির পথিকবন্ধু আশ্রমিক
সুরেন্দ্রনাথ কর — ৭২
আমার প্রিয় দাদা বীরেন্দ্রমোহন সেন — ৮৩
আশ্রমের টুলুদি — ৮৯
বড় ডাক্তারবাবু শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়— ৯৩
আশ্রমিক পুলিনবিহারী সেন— ৯৬
জন্মশতবর্ষে আশ্রমবধূকে আশ্রমকন্যার
শ্রদ্ধা নিবেদন — ১০৪
আমাদের আদরের পুপেদিদি — ১০৯
আশ্রমকন্যা ইন্দিরা — ১১৪

সুর-শিল্পী আশ্রমিক অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় — ১১৮
আমার শৈশববন্ধু সাগরভাই — ১২২
নিবন্ধ **১২৭-২০০**
ভারতের ধর্ম — ১২৯
আমাদের সংস্কৃতি — ১৪৬
রবীন্দ্রসাধনার সোনার ফসল ঃ
বিশ্বমানবের মনে-মনে প্রেমপ্রীতির
সেতুবন্ধন কথা — ১৬০
আশ্রমকন্যার অনুভূতিতে রবীন্দ্রনাথের
নারী-ভাবনা — ১৭০
শ্রেয়সী-আলাপিনী — ১৭৪
নটীর পূজার জন্মকাহিনী — ১৮২
বর্ষশেষ— ১৮৬
শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস যাত্রিনী — ১৮৮
ভাষণ 'বাহাই্' — ১৯২
প্রীতিডোরে বাঁধা আশ্রমকন্যা আমরা — ১৯৭

সুরের গুরু দিনেন্দ্রনাথকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ

বাল্মীকি প্রতিভায় শুভ্রবসনা বীণাপাণি বাল্মীকির হাতে তাঁর বীণাখানি তুলে দিয়ে বলেছিলেন—

আমি বীণাপাণি তোরে এসেছি শিখাতে গান
তোর গানে গলে যাবে সহস্রপাষাণ প্রাণ
... ...
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর
বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত
এইনে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার

এমনি করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সুরের বীণাখানি তুলে দিয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথের হাতে। বুকে তুলে নিয়েছিলেন সেই বীণা দিনেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রসংগীতের সুরে বেঁধে নিয়েছিলেন তিনি তাঁর সংগীতময় জীবনের তার।

রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র হলেন দিনেন্দ্রনাথ। পিতা তাঁর দ্বিপেন্দ্রনাথ, মাতা সেকালের প্রথম ঔপন্যাসিকা কুসুমকুমারীর সুগায়িকা কন্যা সুশীলা দেবী। মাতা সুশীলাদেবীকে তিনি হারান যখন তাঁর মাত্র আট বৎসর বয়স। বোন নলিনীদেবীর বয়স তখন ছয়। দ্বিপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পত্নী হেমলতা ঠাকুর। আশ্রমবাসী সকলের বড়মা, মাতৃস্নেহে মানুষ করে তোলেন এই বালক-বালিকা দুটিকে।

শিশুবয়স থেকে দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠে পাখীর মত সহজ ধারায় সুর খেলা করত। তারপর লেখা পড়ার সঙ্গে বড় বড় ওস্তাদের কাছে শিখেছেন মার্গসংগীত। তাই তাঁর গানের ভিত্তিটি ছিল পাকা। রাগরাগিনী সুরতাললয়ে তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ শিল্পী।

রবীন্দ্রনাথের গানের আকর্ষণে ছাত্রাবস্থায় তিনি চলে আসেন শান্তিনিকেতনে। কিন্তু শুধু গান নিয়ে তো জীবন চলবে না। তাই ব্যারিস্টারি পড়তে তাঁকে চলে যেতে হল বিলেতে। সেখানে ব্যারিষ্টারি শিক্ষা করেন, কিন্তু মন তাঁর ঘুরে বেড়ায় পাশ্চাত্য সংগীত এবং পাশ্চাত্য সুর-যন্ত্রের আশেপাশে। ব্যারিস্টারি শিক্ষায় পদে পদে সৃষ্টি হয় বাধা। নদী যেমন নানা বাধা কাটিয়ে আপন বেগে তার বয়ে চলার পথটি কেটে নেয়, সুরসাধক দিনেন্দ্রনাথের জীবনও তেমনি নানা বাধা কাটিয়ে দেশী বিদেশী সংগীতের ধারায় আপন পথটি কেটে বয়ে চলল। প্রসঙ্গত বলি, দিনেন্দ্রনাথ নিজের শখে নানা দেশের জাতীয় সংগীত আগ্রহে শিখেছিলেন। ব্রিটিশ, আমেরিকান, জার্মান, ফরাসী, জাপানী প্রভৃতি সব দেশের জাতীয় সংগীত আমাদের গেয়ে শোনাতে ভালবাসতেন। ব্যারিষ্টারি পড়া অসমাপ্ত রেখেই সুরের আবেগে একদিন তিনি ফিরে এলেন দেশে। কাব্য সাহিত্য গানের পথ বেয়ে চলে এলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পাশে। শান্তিনিকেতনেই আছেন পিতামহ দ্বিজেন্দ্রনাথ, আছেন পিতা দ্বিপেন্দ্রনাথ, মাতা হেমলতাদেবী। এখানে রবীন্দ্রসংগীতের স্রোতে ভাসিয়ে দিলেন তিনি নিজেকে। সঙ্গে সঙ্গে চলল সাহিত্য কাব্য সাধনা। ইংরেজীভাষায় পারদর্শী তিনি ফরাসী ভাষাও শিখলেন সিলভাঁ লেভির কাছে। ফরাসী ভাষা শিখে ফরাসী সাহিত্যের রসে পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি। নিজে ছিলেন তিনি কবি। কিন্তু প্রখর রবিরশ্মিতে ঢাকা পড়ে গেল তাঁর নিজের সৃষ্টি। তাঁর কবিরূপটি কেউ দেখতে পেলনা, জানতেও পারল না। মনের আবেগে তিনি কবিতা লিখেছেন, গানে সুর দিয়েছেন কিন্তু তা প্রকাশও করলেন না, রক্ষাও করলেন না। তাঁর প্রিয় শিষ্যা আমার বন্ধু সুগায়িকা খুকু অমিতা সেন দিনেন্দ্রনাথের গান ও কবিতা সম্বন্ধে লিখছেন— "তাঁর পিতামহ স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথের মতন তিনিও রাশি রাশি ফুল ফুটিয়ে দক্ষিণের হাওয়ায় সব ছড়িয়ে দিতেন, কিছুই সঞ্চয় করতেন না। একটি কুঁড়িও না।" এই খুকু অমিতা সেনের পীড়াপীড়িতে দিনেন্দ্রনাথ তাঁর রচিত গুটি কয়েক গান আমাদের দু-তিনজনকে শিখিয়েছিলেন। ৫০/৬০ বৎসর আগের কথা লিখতে বসে মনের গভীরে গেঁথে থাকা একটি গান, যেটি কোনো খাতায় কখনো লিখে রাখিনি, মনে পড়ে গেল। মনে মনে গুণগুণ করতে করতে গানটি লিখে ফেললাম। পরে

একদিন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত দিনেন্দ্ররচনাবলী দেখে গানটি মেলাতে বসে দেখি গানের একটি কথাও ভুল লিখিনি। গানটি পড়ে শোনাচ্ছি। কথাগুলো শুনলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। কেন এই গানটি স্বপ্নবিলাসী কিশোরী যুবতী বয়সে এমন করে মনে গেঁথে গিয়েছিল। বুড়ো বয়সে গাইবার কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ না হয়ে গেলে, এবং কণিকা নীলিমারা সামনে বসে না থাকলে গানটি হয়তো গেয়েই শোনাতে পারতাম। গানটি হল—

যারে ভালবেসেছিলি
সে কি শুধু আছে মনে
আপনারি জাল বোনা স্বপনের
কোণে কোণে।
প্রভাতবীণায় আজি
তারি স্মৃতি ওঠে বাজি
ব্যথাভরা ম্লান হাসি
বিকশিত ফুলবনে।
দক্ষিণ পবন তারি পরশ বুলায়
পাতায় পাতায় সে যে আঁচল দুলায়।
নীলাকাশে মনে লাগে
করুণ নয়ন জাগে
বিরহ কাঁদন তারি
শুনি কাকলী-কূজনে।

সতের বৎসর বয়সে দিনেন্দ্রনাথের প্রথম বিবাহ হয় প্রতিমা দেবীর মাসি সুনয়নীদেবীর কন্যার সঙ্গে। নাম ছিল তাঁর বীণাপাণি। বিবাহের অল্পকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে কোনোদিন দিনেন্দ্রনাথ ভুলতে পারেন নি। তাঁর কবিতা গান বেশির ভাগই বীণাপাণির উদ্দেশে নিবেদিত। সেই কবিতা এবং গানগুলি একসঙ্গে কোরে একবার একটি পুস্তিকা তিনি ছাপান। পুস্তিকাটির নাম দেন "বীণ"। হৃদয়ের আবেগে বই ছাপালেন, আবার আবেগের বশেই একদিন সেই বইগুলি সব নিজে হাতে পুড়িয়ে ফেললেন। দৈবাৎ বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া অল্প কয়েকটি বই অন্তরঙ্গজনেদের কাছে আজও যত্নে রক্ষিত আছে।

পুনরায় ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কমলাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। অত্যন্ত সুখী দম্পতি ছিলেন তাঁরা। এঁদের দুজনের নানা প্রেমের কাহিনী মায়েদের মুখে শুনেছি।

এঁদের বেণুকুঞ্জে বাসের স্মৃতি আমার মনে ঝাপসা হয়ে গেছে। কিন্তু দেহলী বাড়ির নীচের তলায় তাঁদের বাসের স্মৃতি মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। দেহলীর পাশে নতুন বাড়িতে থাকতাম আমরা। দুজনেই অত্যধিক স্নেহ করতেন আমাদের। তাই দিনভোর চলত আসা-যাওয়া। দিনেন্দ্রপত্নী নামেও ছিলেন কমলা, তাঁর সংসারটিও ছিল কমলা, লক্ষ্মীর সংসার। ভোর থেকে শুরু হোতো কমলাদেবীর সংসারের কাজ। মাটিতে আসন বিছিয়ে বসে কুটনো কাটা, ভাঁড়ার বার করা, সামনে পান বিছিয়ে আসনে বসে ঠাকুরবাড়ির রীতি অনুযায়ী নানা উপাদানে চৌকো পানের খিলি বানানো— সব কিছু কাজ ছিল তাঁর শিল্পসৌন্দর্যে ভরা। নানাবিধ খাবার বানিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের খাইয়ে তিনি তৃপ্তি পেতেন। সন্তান ছিল না তাঁদের। আশ্রম বালক-বালিকা সবাই ছিল তাঁদের সন্তান। শুধু কি বালক-বালিকা? অধ্যাপকরাও কমলা দেবীর হাতে বানানো খাবার থেকে বঞ্চিত হতেন না।

তাঁদের দেহলী বাড়ির উত্তরে দুটি সফেদা গাছ এবং একটি চালতা গাছের নীচে, যেখানে শ্রীরামপুরের একজন তাঁতী লাল-নীল-সবুজ-হলদে রঙের সুতোয় টানা দিয়ে কিছুদিন আমাদের মা-দের তাঁত বুনতে শিখিয়েছিলেন, সেখানেই একটি তক্তপোষ পাতা থাকত। এই তক্তপোষে বসে দিনেন্দ্রনাথ ইংরেজী-বাংলার ক্লাস নিতেন। বাড়ির পূর্বে ছিল সাজানো ফুলের বাগান। রঙবেরঙের ফুলে এবং নানাজাতীয় পাতাবাহার গাছে বাগানটি আলো করে রাখত। বাগানের পুব প্রান্তে, বোলপুর যাবার রাস্তার ধারে ছিল হরীশ মালির ঘর, যার কাছে গিয়ে ভূট্টা পোড়া, লাল আলু পোড়া খাবার প্রচণ্ড লোভ ছিল আমাদের।

এই দেহলী বাড়ি থেকেই কমলাদেবীর অতি আদরের হরিণটি হারিয়ে গিয়েছিল।

এই বাড়িরই বড় ঘরে দিনেন্দ্রনাথ সব অভিনয়ের মহড়া নিতেন— বাল্মীকি প্রতিভা, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, ডাকঘর প্রভৃতি। যার যার ভূমিকায় সকলকে অভিনয় করতে তিনিই শেখাতেন। আবার শারদোৎসবে ভাবনৃত্যও

তিনিই প্রথম দিকে সকলকে শেখাতেন। তিনি নিজে খুবই ভাল অভিনয় করতেন। পুরোনো লাইব্রেরীর সামনে বিসর্জন নাটকে রঘুপতির ভূমিকায় তাঁর অভিনয় যাঁরা দেখেছেন কেউ কি তা কখনো ভুলতে পারবেন! আম্রকুঞ্জে শারদোৎসবে ঠাকুরদার ভূমিকায়; নাট্যঘরে বৈকুণ্ঠের খাতায় বৈকুণ্ঠের চরিত্রে, বশীকরণে অন্নদার চরিত্রে তাঁর অভিনয়ের কথা স্মরণ করলে আজও আনন্দের পুলক পাই। বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম দস্যু এবং অচলায়তনে পঞ্চকের ভূমিকায় তাঁর অপূর্ব অভিনয়ের কথা মা-দের মুখে শুনেছি। আবৃত্তিও করতেন চমৎকার। কথা কাহিনীর সব কবিতাই তিনি আবৃত্তি করে শোনাতেন আমাদের। মুগ্ধ হয়ে আমরা শুনতাম। সাহিত্য সভাতে আবৃত্তি করতেও তিনিই আমাদের শেখাতেন। দিনেন্দ্রনাথের আবৃত্তি, অভিনয়, ভাবনৃত্যের ধারা রবীন্দ্রনাথের ধারার সঙ্গে একসুরে বাঁধা ছিল। তাই বিরোধ দেখা দিতনা কখনও। রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে তিনিই সব কিছু শেখানোর ভার নিতেন। কাজ এগিয়ে থাকত অনেকটা। তাঁর শেষ অভিনয় দেখেছি কলকাতায় জোড়াসাঁকোর প্রাঙ্গণে তপতী নাটকে দেবদত্তর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ রাজা বিক্রমের থেকে এতোটুকু পিছিয়ে থাকেন নি তিনি অভিনয়ে।

দেহলী বাড়ি ছেড়ে যখন তিনি আশ্রমের উত্তর প্রান্তে খোওয়াই-এর ধারে সুরপুরীতে উঠে গেলেন তখনও আশ্রমের মধ্যে তাঁকে পেয়েছি সব সময়েই। প্রচণ্ড রোদ্দুরে ছাতি মাথায় হন্ হন্ করে হেঁটে চলে আসতেন আশ্রমের গানের ক্লাস নিতে। ক্লাস নিতেন কখনো শিশুবিভাগে, কখনো পশ্চিম তোরণের নীচের তলায়, কখনো বা কলাভবনের হ্যাভেল হ'লে। সুরপুরীতেও তিনি গানের ক্লাশ নিতেন। শেষের দিকে গানের সব মহড়াই বসত উদয়নের পশ্চিমের ঢাকা-বারান্দায়।

সেকালে চায়ের আড্ডাটি বসত দিনেন্দ্রনাথেরই বাড়িতে। এই আড্ডায় প্রধান ছিলেন নন্দলাল, তেজেশচন্দ্র, মল্লিকজী। সেকালে ক্ষিতিমোহনও ছিলেন চা-রসিক। তাই "দিনু সাহেব দিনু সাহেব" বলে হাঁক দিতে দিতে তিনিও গিয়ে হাজির হতেন এই চায়ের আড্ডায়, সরস গল্পে মাতিয়ে তুলতেন আসর। শাস্ত্রীমশাই চা-রসিক না হয়েও শুধুই আসরের আকর্ষণে যোগ দিতেন এই চা-চক্রে। দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কমলা দেবীর সহায়তায়